গুরু বিবেকানন্দ

মধুমিতা ঘোষ

কাশীপুর উদ্যানবাটী। অন্তরঙ্গদের কাছে রেখে তৈরি করার পর্ব। সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কাগজে স্বহস্তে লিখেছিলেন—''নরেন শিক্ষে দিবে।''[১] নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের বাঁধন-হারা টান। নরেনের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। সে 'নরনারায়ণের নরঋষি'। সহস্রদল পদ্ম, রাঙাচক্ষু বড় রুই। অখণ্ডের ঘর, নিত্য সিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। তার মতো আর একটিও নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করেন; তিনি তার অনুগত।[২] নরেন্দ্রের জন্যই তো সব।[৩] নরেনের বিরহে প্রাণ আঁটুপাঁটু, আর তাকে কাছে পেলে অবতারপুরুষটি উথাল-পাথাল।

সপ্তর্ষির ঋষি নরেন্দ্রের ইচ্ছে ছিল শুকদেবের মতো সমাধিমগ্ন হয়ে থাকার। কিন্তু উত্তম বৈদ্যের হাতে পড়ে সব ইচ্ছে, সব সুখ—জলাঞ্জলি। পরম পুরুষার্থ 'মোক্ষ'ও হাতছাড়া। কারণ, জহুরি চিনেছে জহর। গুরু তাকে দিয়ে যেতে চান আরও উচ্চ অবস্থা। উপযুক্ত আধারে প্রবাহিত করে যেতে চান অনন্ত শাশ্বত 'গুরুশক্তি'র ধারাটিকে।

চিরমুক্ত-চিরস্বাধীন তেজীয়ান ছেলেটিকে লাগাম পরানো কি অতই সোজা? চলে কত লীলা, কত খেলা। শেষে অ-জাগতিক ভালবাসায় সব লড়াই, সব বাহানার পরিসমাপ্তি। গুরু বলেন, ''তোর ঘাড় করবে।''[৪] দৃঢ়কণ্ঠে জগদম্বার বালকটি জানিয়ে দেন—''মা-তোকে তাঁর কাজ করার জন্য সংসারে টেনে এনেছেন''—''আমার পশ্চাতে তোকে ফিরতেই হবে। তুই যাবি কোথায়?''[৫] বলরামবাবুর বাড়িতে একদিন নরেন্দ্র-শরীরে বিশেষ স্পর্শ। সচকিত নরেন : ''Lo! the man is entering into me!''[৬]

অন্ত্যলীলাকাল। প্রাণপ্রিয় নরেনকে যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এক হয়ে গেলেন। তত্ত্বের ভাষায় তাঁরা যে 'অভেদ'!—আমি আর তুই কি 'আলাহিদা'![৭]

নরেন্দ্রকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের মন অখণ্ডে বিলীন হয়ে যায়। খণ্ডভাব দূর হয়। এদিকে আবার যে-শ্রীরামকৃষ্ণ 'খণ্ডন ভববন্ধন', তিনিই কিনা জগৎকার্যে বদ্ধ করলেন তাঁর নরেনকে! চিরকাঙ্ক্ষিত নির্বিকল্প সমাধির চকিত আস্বাদ পাইয়ে দেওয়ার পর জানিয়ে দিলেন—''এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।''[৮] মর্ত্যলীলা অবসানের দুদিন আগে দলনেতা নরেন্দ্রের হাতে দিয়ে গেলেন তাঁর বাকি সন্তানদের দায়ভার—''তোর হাতে এদের

সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।"[৯] শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে আরও এক ব্রত প্রদান করেছিলেন, মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতার বলে জগৎ জয় করতে হবে।[১০]

'রাজার রাজা' স্বামী বিবেকানন্দ এখন 'দাস তব জনমে জনমে'। দেবশিশুর অপূর্ব সুললিত ক্ষুদ্র দুবাহুর কণ্ঠ-আলিঙ্গন আর সুমিষ্ট আহ্বান—আমি যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। সেই সাদর-আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি সপ্তর্ষির ঋষি। যোগভূমির অমর্ত্য-রসাস্বাদনের আনন্দ ত্যাগ করে তাঁকে নেমে আসতে হয়েছিল মর্ত্যলোকে। আর তারপর—এ কী 'গুরু'-দায়ভার অর্পণ!!

দুই

অধ্যাত্ম ভারতবর্ষ। এদেশ ধর্মের দেশ। এদেশে অভাব অনেককিছুর। কিন্তু অভাব নেই তথাকথিত 'গুরু'র। কত মত, কত পথ। কত উপদেশ, কত নির্দেশ। কঠিন ধর্ম, সহজ ধম্ম। অধিকারী-কাল-স্থানভেদে ধর্মের কত আকার, কত প্রকার। কত বিকাশ, কত প্রকাশ। নতুনভাবে আর কী আছে পাওয়ার! গুরুবাদের তত্ত্বকথা, শাস্ত্রকথা—সে তো সনাতন। সে তো চিরপুরাতন হয়েও চিরনবীন। সে যে অতি গুহ্যকথা—মনের আলো, প্রাণের অমৃত। সে তো অনাদি, চিরসত্য। তাত্ত্বিকতার পরশমণি হৃদ্‌মাঝারে সংগোপনে রেখেও কী সেই জাদুকাঠি—যা জাগিয়ে দিল শত হাজার প্রাণকে? 'গুরু' বিবেকানন্দের কী সেই অমোঘ আকর্ষণ, যা কিনা গুরুর গুরুত্ব-কে পৃথকভাবে জানান দেয় না? সে এই আলো-বাতাস, এই বারিধারাপাত কিংবা মাতৃস্নেহ-ভালবাসার নিরবচ্ছিন্ন ধারার মতো চিরস্বাভাবিক, চির সাবলীল। কী সেই সোনার কাঠি যার ছোঁয়ায় গুরু-শিষ্য, দাতা-গ্রহীতা, উচ্চ-নিম্নের ভেদরেখা মুছে যায়? স্বামীজী হয়ে ওঠেন 'আমার'—'আমাদের'?

জগৎ-উদ্ভাসক সূর্যকে ঘাসের ডগার ছোট্ট শিশিরবিন্দুও পায় তার বুকের মাঝে আপন করে। সূর্যালোকের উজল-পরশে সেও ঝিকমিকিয়ে ওঠে হীরককুচির মতো। গুরু তো তিনিই যিনি সব আধারকে পূর্ণ করেন। যিনি উন্নত করেন, উত্তরণ ঘটান। গড়ে তোলেন। অসৎ থেকে সৎ-এ, তমসা থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যান—জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে। গুরু তাঁর অনাবিল অমল পরশে জাগিয়ে দেন। মোহনিদ্রা টুটে যায়। যে শুয়ে ছিল সে উঠে বসে, যে বসে ছিল উঠে দাঁড়ায়, যে দাঁড়িয়ে ছিল চলতে শুরু করে। অচিন গুরু প্রাণে সুর তুলে দেন—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'। আহ্বান জানান—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

স্বামী বিবেকানন্দ তাই করেছিলেন। 'আমার আমি'-কে—তত্ত্বকথায় বলতে গেলে 'আমার আত্মা'-টিকে ডাক দিয়েছিলেন। ''লোককে ঠেলে তুলে দেবার অসীম শক্তি তাঁর ছিল। স্বামীজীর কথা শুনলে মরা মানুষ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলত—'দাঁড়াও দাঁড়াও! মরে তো গেছি, কথাটা একবার শুনে যাই।' তাঁর কথায় এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে তখনই পৌঁছত...। সময়ের ভুল হয়ে যেত। লোক নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তুলে দিতে পারতেন।"[১১]

স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃতই গুরু।

তিন

হৃদয়বান বুদ্ধিমান বীরের স্কন্ধে সুবিশাল দায়ভার অর্পণ করে 'এঘর থেকে ওঘরে' গেলেন

শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ-মুষায় জীবনটাকে গড়তে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও নরেন তাঁর অপার্থিব নিবিড় ভালবাসায় আর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য-ডোরে বাঁধতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপরাপর সন্তানদের। নরেন্দ্র তাঁদের নেতা, শিরদার—সর্দার। নরেন্দ্রই এইসব দানা-দৈত্যদের সকল সময়ের আশা-ভরসা, সুখ-সান্ত্বনার স্থল। ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের 'খুব ভালবেসে যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা'[১২] করতে নরেন কৃতসংকল্প।

গোড়াপত্তন হল বরাহনগর মঠের। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হোমাপাখির ছানাদের মনে যে-ত্যাগ-বৈরাগ্যের বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটিয়ে গিয়েছিলেন গুরুসম গুরুভ্রাতার সকাশে তার কিশলয়গুলি তিরতিরিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করল। বিরাট বটবৃক্ষের আশ্রয় পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়রা। চলল 'একত্রে রেখে দেখাশোনা' করার পর্ব। একদিন আঁটপুরে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে ধুনির লেলিহান পবিত্র শিখাকে সাক্ষী রেখে সংসারত্যাগের অটুট সংকল্প গ্রহণ করলেন তাঁরা। বৈরাগ্য-তুফানে উথাল-পাথাল হৃদয়দরিয়াগুলিকে উদ্দীপিত করতে লাগল নরেন্দ্রের অভিভাবকত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ তো তাঁদের সন্ন্যাসী করে দিয়েইছিলেন, গেরুয়াবস্ত্রও তিনি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বিরজা হোমান্তে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসগ্রহণ ও সন্ন্যাস নাম প্রদানের ঋত্বিক পুরুষটি সেই নরেন্দ্রনাথ—তখন যাঁর সন্ন্যাস নাম হয়েছিল 'বিবিদিষানন্দ'! গুরুর সূচিত কর্মকে পূর্ণতা প্রদানের পুরোধা যে তিনিই।

পিতার শাসনে, মাতার স্নেহে, ভ্রাতার সৌহার্দ্যে আর সর্বোপরি সখার প্রেমে আর এক 'দৈবী মায়ার সংসার'-এ আবদ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শুকদেব। ভাবী সঙ্ঘের কড়ি-বরগা, স্তম্ভগুলির অটুট গড়ন দেওয়ার কাজে প্রাণ সঁপে দিলেন। লক্ষ্য—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরাশিকে আত্তীকরণ করা—জাগিয়ে তোলা, হয়ে ওঠা। ওস্তাদ-সান্নিধ্যে নিরন্তর তালিম, সতত লালন- পালন। প্রবল অনটন, সুতীব্র তিতিক্ষা, প্রখর কৃচ্ছ্রসাধনের ঊষর মরুতে নরেন্দ্রের অদ্ভুত ভালবাসা সবকিছুকেই আনন্দময় করে তুলত। সম্পর্ক-বুনটের মধ্যেকার অঙ্কট-বঙ্কট, খিঁচগিঁটগুলি নির্মম হস্তে সরিয়ে দিতে লাগলেন গুরুকল্প গুরুভ্রাতা। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানেরা ভাবী রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘশরীরের অচ্ছেদ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠতে লাগলেন।

যেদিন নরেনকে সব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সেদিন তাঁর চোখে ছিল আনন্দাশ্রু। সে-আনন্দাশ্রু বোধহয় নবীন নরেন্দ্রের মধ্যে অনন্ত কালব্যাপী যুগধারার চিরপ্রবীণ পূর্ণ গুরুসত্তার ভাবী উদ্ভাসনটি উপলব্ধি করে! শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন এখন—''...দাস তব প্রস্তুত সতত/ সাধিতে তোমার কাজ।"

চার

চোখ বুজলেই ঈশ্বর আছেন, আর চোখ চাইলেই কি ঈশ্বর নেই? অন্তর্মুখ প্রাণগুলিকে গুরুপ্রদত্ত ব্রতে সক্রিয় করতে হবে। তাঁদের আত্মনির্ভরশীল করতে হবে, করতে হবে স্বাবলম্বী। এঁরা যে 'সেই' প্রদীপ থেকে জ্বলা—সব এক একটি প্রদীপ। তাই তাঁদের প্রত্যেককে হতে হবে স্বতঃপ্রকাশ-দীপশিখা।

''ভগবান রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়িয়ে বাংলায় যে উর্বরতা সাধন করে গিয়েছেন, তাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভাল হবে কেন! তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া-রোয়ার ভার পড়েছিল। এ-কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়োদর্শন জাত যেটুকু স্পর্ধার প্রয়োজন, সে সকলই বিবেকানন্দের পূর্ণমাত্রায় ছিল।"[১৩] সেই স্পর্ধা, বিবেকানন্দ-মানসের বজ্রসম সেই ইচ্ছাশক্তির প্রবাহটিকেই চারিয়ে দিতে চাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্বাচিত 'লিডার'।

গুরুভ্রাতা-শিষ্য-অনুগামীদের মধ্যে কর্মের প্রবল

স্রোত বইয়ে দিতে হবে। অন্তর্মুখী মানুষগুলোকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে হবে—বহন করতে হবে কর্মের শৃঙ্খল। পরিত্যাগ করতে হবে ইহলোক-পরলোকের আশা। বিলীন হবে শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছা। ''যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে।''[১৪] ''...তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে।''[১৫] ''মহাশক্তিতে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কর।... মহাবলে কাজে লাগিয়া যাও।... But work, work, work এই মূল মন্ত্র। যেখানে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) তেজের বীজ পড়বে, সেখানেই ফল ফলবে—অদ্য বা শতাব্দান্তে বা।''[১৬] ''... যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার মণি।''[১৭] ''যারা আমার মনের মতো কার্য করবে আমি তাদের চেলা।''[১৮]

জহুরিরাজের শিষ্যটিও আর এক পাকা জহুরি। খাঁটি রত্নগুলির প্রকৃতি তাঁর নখদর্পণে। তাঁদের মধ্যে মহাশক্তির প্রকাশ লক্ষ করেছেন তিনি—''আমি তোমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতা জানি।''[১৯] শশী মহারাজের দৃঢ় নিষ্ঠা, কালী ও যোগেন মহারাজের প্রবল কর্মক্ষমতা, নিরঞ্জন মহারাজ, সারদা মহারাজের নানাস্থানে বড় বড় কার্যের প্রবর্তন, হরি মহারাজের বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি আর তিতিক্ষা; তুলসী, গুপ্ত, বাবুরাম, শরৎ প্রভৃতি সকলের মধ্যেও এক এক মহাশক্তি রয়েছে। সেই মহাশক্তিগুলিকে আদেশে-শাসনে, প্রেমে-ভালবাসায়, আদরে-আবদারে-মিনতিতে সক্রিয় করেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এটিই, এমন দিক্‌পাল ব্যক্তিত্বগুলি কী অদ্ভুত জাদুতে নরেনের বশংবদ—'ক্রীতদাস'! হয়তো কখনও মৌখিক বাদ-প্রতিবাদ, মান-অভিমান, যুক্তিতর্কের পালা চলে। কিন্তু অবশেষে হৃদয়-নিংড়ানো ভালবাসার দাবি, সকরুণ আর্তি—''তাহলে কি ভাই, আমি একাই খেটে খেটে মরব?''[২০] হৃৎসাগরে তুফান ওঠে। বান্দা হয়ে হাসিমুখে কর্মরথচক্রকে সচল করতে জীবন বলি দেন তাঁরা। বেহিসেবি গুরুর বেহিসেবি শিষ্যের দল! মনে-প্রাণে অনুভব করেন নরেনের মধ্যে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। নরেন 'ঠাকুরের হাতের যন্ত্র ছাড়া কিছু' নয়।[২১]

আর তাই পূর্ণস্বাতন্ত্র্য রেখেও পদচিহ্নানুসরণ—''What have I done? I have simply follwed the foot-prints of our illustrious leader.''[২২]

গুরুবাক্যের, গুরুর স্বপ্নের আর তাঁর ইচ্ছার সার্থক বাস্তব-রূপায়ণেরই আর এক নাম জীবন।

পাঁচ

আসল গুরু সচ্চিদানন্দ। তিনি সকলের অন্তরে সতত বিরাজমান। তবে অনেক সময়ই জীব তার অন্তরতর সচ্চিদানন্দ গুরুর খোঁজ পায় না। পথ হারিয়ে হাতড়ে বেড়ায়—কীসে সে উদ্ধার হবে। প্রাণের আকুতিতে কেঁদে কেঁদে ফেরে—'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।' সত্য-আকুতির সেই টানে তখন 'ভাবের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা'। সে যে মনের মানুষ—প্রাণের প্রাণ। 'মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা।'

সত্যিই 'নয়নে তার যায় গো চেনা'। বুকের কলিজা-র ব্যঞ্জন সাজিয়ে চাঁদমুখে ছাই মেখে তাঁর 'পায়ের বেড়ি' হতে হয়।

আর গুরু তখন কী করেন?

—খরস্রোতা পার্বত্য নদী। স্রোতের তলায় ভয়ংকর পিচ্ছিল পাথর আর নুড়ি। ওই খরস্রোতের মধ্যে এক-পা পিছলালেই মৃত্যু অবধারিত। শিষ্য দিব্যি ঘোড়ায় চড়ে। আর গুরু স্বয়ং নিজের জীবন বিপন্ন করে সহিসের মতো ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াকে আর 'বেয়াড়া' শিষ্যটিকে সামলে নিয়ে এগিয়ে চলেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও, ঘোড়াশুদ্ধ শিষ্যকে পার করেন।[২৩]

জীবননদীর হালের মাঝিই গুরু।

স্বহস্তে আহার পরিবেশন করেন গুরু। আহারান্তে শিষ্যার হাত ধোয়ার জন্য নিজেই জল ঢেলে দেন। তোয়ালে দিয়ে সস্নেহে হাতদুটো মুছিয়ে দেন। শিষ্যার প্রতিবাদে গাম্ভীর্যপূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তর আসে—''ঈশা তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।''[২৪]

বর্ষণমুখর আঁধার রাতে শত শত মাইল দূর থেকে আগত দুই নারী। সেই মানুষটির পদপ্রান্তে এসে তারা জানায়, ''যিশুখ্রিস্ট যদি এই পৃথিবীতে এখনও থাকতেন, তাহলে তাঁর কাছে যেমন করে আসা উচিত ও উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তেমনিভাবে আপনার কাছে এসেছি।'' 'কৃপাবারি ঝরে পড়ে।' অস্ফুটকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, ''শুধু যদি আমার যীশুখ্রিস্টের মতো শক্তি থাকত এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত করে দেবার!''[২৫]

জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত 'Prima Donna' পাশ্চাত্যের সংগীত সম্রাজ্ঞী এসে দাঁড়ান ধ্যাননিমীলিত ভারতীয় যোগীর সামনে। যোগীর গভীর গম্ভীর সুরতরঙ্গ-সদৃশ স্বরে জাগে বিস্ময়। "My child, what a troubled atmosphere you have about you! Be calm! It is essential." নৃত্য-গীতের উর্বশীর আন্তরজীবনে নেমে আসে প্রশান্তি। সে-নারীর কাছে গুরু তখন 'Mon Piere'—'আমার পিতা।'[২৬]

ছোট্ট বালকটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। জুতোর ফিতেগুলো খোলা। হাঁটু গেঁড়ে বসেন পথচারী। সযত্নে বেঁধে দেন জুতোর ফিতে। বালকটির অজান্তেই তিনি যে তার গুরু।[২৭]

সেবাকাজের ত্রুটিতে গুরুর কানমলা খেয়ে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সেবক। দেখতে পেয়ে সেবকের গলা জড়িয়ে চোখের জল মুছিয়ে আবদার করে গুরু বলেন, ''ওরে, কিছু মনে করিসনি। তোদের ভালবাসি, তাই এমন করে ফেলি। তোরা আপনার লোক।''[২৮] একদিন সেবা করতে করতে গুরুর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সে-সেবক। পাছে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাই নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকেন গুরু—সেবকের ঘুম ভাঙার অপেক্ষায়...।[২৯]

ছেলেমানুষ সন্তানটি চায় সন্ন্যাসী হতে। গুরুর আদেশে ভিক্ষা-সংগ্রহে বেরোয়। বেলা বাড়ে। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে খেয়াঘাটে তারই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে উপবাসী গুরু। বেলাশেষে শিষ্যের স্বপাক পবিত্র ভিক্ষান্নে উভয়ের পরিতৃপ্তি।[৩০]

হিমালয়ের দুর্গম পথ। বলিষ্ঠ পদে অগ্রগামী গুরু। হতক্লান্ত, শ্লথগতি শিষ্য নিরুপায় হয়ে ভারি বুটজোড়া খুলে পুঁটুলিতে ভরে। কঠিন, বন্ধুর-পিচ্ছিল পথে ভারসাম্য রাখাই যে দুঃসাধ্য। দৃঢ়হস্ত প্রসারিত করে শিষ্যের দেহটিকে সবলে ধরে পথ চলতে থাকেন গুরু। মাথায় তাঁর শিষ্যের সেই পুঁটলির বোঝা![৩১]

রোগগ্রস্ত ভগ্ন শরীরে প্রয়োজন বিশ্রাম। সেবকেরা দেখা-সাক্ষাতের সময়কাল নিয়মে বাঁধতে চান। চিরপরহিতাকাঙ্ক্ষী প্রেমিকহৃদয় মানুষটির আকুতি, ''তারা এত কষ্ট করে দূর দূর থেকে হেঁটে আসতে পারে, আর আমি এখানে বসে বসে, একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে, তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারব না?''[৩২]

আর তাই তিনি গুরু।

ছয়

গুরুর আশ্বাস, ''আমার চেলারা যদি হাজারবার নরকে যায়, তাহলে আমিই তাদের হাজারবার হাত ধরে তুলব। তা যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুর-আদি সব মিথ্যা।''[৩৩] শিষ্য একদিন জানতে চায়, ''যদি আমার পতন হয়?'' তৎক্ষণাৎ উত্তর, ''হাজার পতন হোক, কিছু এসে যায় না। আমারই সে-দায়িত্ব, আমিই তোমাকে বেছেছি, তুমি আমাকে বাছোনি।''[৩৪]

বিকিয়ে যায় শিষ্য—''আমি তাঁর সন্তান—তিনি তো আর আমার কোন অপরাধ নেবেন না। তাঁর কাছে আমার সব দোষের ক্ষমা আছে। তিনি যে আমার বাপ, মা, গুরু, সবই।''[৩৫]

গুণগ্রাহী গুরু শিষ্যের সামান্য গুণকেও এতটাই বড় করে দেখেন আর সামান্য একটু ভাল কাজেও এতটাই মুগ্ধ হন যে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে পরমানন্দে সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করে।[৩৬] অতি ছোটও তাঁর আওতায় বড় হয়ে যায়।[৩৭] প্রতিটি ছোট ছোট কাজের মধ্যেও সম্পূর্ণ নিখুঁত করে তৈরি করে তোলার শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর।

গুরু বিবেকানন্দ চাইতেন তাঁর সন্তানেরা তাঁর থেকেও শতগুণে বড় হোক—''I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be.''[৩৮]

আসলে স্বামীজী প্রেমের প্রতিমূর্তি। ''He was all love.—তাঁর সব সত্তাটাই প্রেমময়—ভালবাসা জমাট।''[৩৯] সে-ভালবাসার গভীরতা পরিমাপ করার চেষ্টা বাতুলতা।[৪০] তাঁর পিরিতে পড়লে গোলাম হয়ে যায় মানুষ। আর সেই গোলামগুলিকে কাদার তালের মতো আকার দিতে থাকেন গুরু। হয়ে ওঠেন অমৃতের 'সেতু'। জানিয়ে দেন, ''আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়?... আমরা যে জ্যোতির তনয়!''[৪১] বিবেকানন্দ-তনয়দের তাই উপলব্ধি : "We are not mere Sadhus. We belong to the line of Prophets."[৪২]

শিষ্যের ভূত-ভবিষ্যৎ সবই গুরুর নখদর্পণে। তাদের প্রকৃতি বুঝে রাশ ঠেলে দিয়ে এগিয়ে দেন গুরু। যার মধ্যে যতটুকু গুণ বা শক্তি দেখেন, তাতেই উৎসাহ দিয়ে তার ভিতরের অব্যক্ত অনন্ত শক্তির উদ্বোধন ঘটান। যে যে-জায়গায় আছে, তাকে সে-জায়গায় সাহায্য করে তার অভাবটা পুরিয়ে দেন। জোর করে পালটে দিলে ভাবের হানি ঘটে যে! শিষ্যবৎসল বালক-স্বভাব গুরু অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো একাত্ম হয়ে যান তাদের সঙ্গে। সখা হয়ে নিটোল ভালবাসায় সখার জীবনের অতি খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকেও মার্জিত ও পরিশোধিত করে তোলেন।[৪৩] তিনি যে আচার্য! কাউকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন না। লোকে যাদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করে তাদের সঙ্গেও বসে দুঘণ্টা আলাপ করেন।[৪৪]

উৎসাহদাতা, প্রশ্রয়দাতা হয়েও গুরুভ্রাতা কিংবা শিষ্যদের দোষ-প্রদর্শনে গুরু কিন্তু সুকঠোর। তবে সে-দোষদর্শন সচেতন করার জন্য, কখনই নিরুৎসাহিত করার জন্য নয়।[৪৫] তাঁদেরকে আদর্শোপম দেখার জন্য। তাঁর মতো এমন ভরসাদাতা আর কোথায়? আদর্শ দেখিয়ে দেওয়া, প্রয়োজনে ধরিয়ে দেওয়া। জীবন যখন আদর্শের অভিমুখে যাত্রা করে, দোষত্রুটিগুলো যে আপনা থেকেই পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময় বিলীনও হয়ে যায়।

স্বামীজী-সান্নিধ্য—সে যে অনুপম। বুকের মাঝে পরমানন্দের ফোয়ারা যেন ফর ফর করে খুলে যায়।[৪৬] নদীর স্রোতের মতো নিরন্তর সে-আনন্দধারা নৃত্যের ছন্দে বয়ে চলে। একদিকে গুরুর দক্ষিণামূর্তি প্রেমের প্রতীক হয়ে প্রেমরসে সকলকে ডুবিয়ে দেন, সকলকেই কোল দেন, বালকসুলভ আনন্দে মুগ্ধ করেন।[৪৭] অপরদিকে তিনিই আবার কঠোরতার প্রতিমূর্তি। গুরু যখন গুরুগম্ভীর রাশভারি—সকলে তখন বাঘের মতো ভয় করে তাঁকে। আর তিনিই যখন নরম হন, মানুষ তো বটেই সামান্য পশুপাখিটা পর্যন্ত ছুটে এসে তাঁর সঙ্গে ভাব জমায়। এক অনির্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি বিকীর্ণ হয় দশদিকে। তিনি হাসলে ভুবন হাসে, তিনি কাঁদলে ভুবন কাঁদে।[৪৮]

গুরুর শাসনে শিক্ষা, হাসিতে-মজাতেও শিক্ষা। এমনকী, সে-গুরু ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়েও

শিক্ষা দেন। হাসতে হাসতে, হাসাতে-হাসাতে, রঙ্গরসের তুফানে ভাসাতে ভাসাতে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতায় সমাধান করে দেন বহু জটিল প্রশ্নের। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। একই সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের বর্ষণ। এক লহমায় সেই নানা মতের এমন একটা মীমাংসা করে দেন গুরু যে সেই সূত্র ধরে অধিকারীভেদেও সবকিছুর সামঞ্জস্য খুঁজে পায় তারা। যুক্তিনিষ্ঠ হৃদয়বান গুরু প্রাণ বোঝেন, মন বোঝেন।[৪৯]

সাত

দরদি গুরুটিই আবার ত্যাগী অধ্যাত্ম-সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে গিয়ে নির্মম। তিনি নিঠুর-দরদি। ধ্যান-ধারণা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান আর ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতা—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ''দেখ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়।''[৫০]

শিষ্যদের দেহ-মনের উপযুক্ততা সাধনের প্রতি গুরুর সুকঠোর দৃষ্টি। প্রত্যেক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্র অনুযায়ী পঠনব্যবস্থা, অনুশাসন বিধি।[৫১] তাদের মনকে কেবল এবং কেবলমাত্র ঈশ্বরমুখী করে গড়ে তোলার জন্য গুরুর অবিরাম পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ নজর, সজাগ দৃষ্টি, প্রয়োজনে বাইরে নিরন্তর কর্ম পরায়ণতা আর সেইসঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাত্ম জীবনযাপন—দুই-ই প্রয়োজন।

সন্ন্যাসের পথ বড়ই দুর্গম। পরীক্ষা করে নেন গুরু : ''সাপের মুখে যেতে বলবো, অগ্ন্যুদ্গারী তোপের মুখে যেতে বলবো—নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিচারমাত্র না করে অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাই করতে হবে। সুখাভিলাষী হলে হবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধমাত্র রাখতে পারবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করে বিসর্জন করতে হবে। 'অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা'—জেনে ত্যাগ করতে হবে! 'গুরুদেবো' 'আত্মদেবো' হয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' জীবনযাপন করতে হবে। পারবে তো?''[৫২]

এই গুরুটিই আবার সস্নেহে প্রিয় সন্ন্যাসি-শিষ্যের গলা জড়িয়ে ধরে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, ''বৎস, প্রভুর কাজে আমি প্রাণপাত করছি। তোমার জীবনও সেই কাজে উৎসর্গ কর। আরও কত জীবন ঠাকুরের সেবায় উৎসর্গীকৃত হবে। সকলের মিলিত আত্মোৎসর্গেই এক মহান ব্রত সংসিদ্ধ হবে।''[৫৩] কখনও বা কর্মে যাত্রার আগে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে পাশে বসিয়ে ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে মাথায় হাত রেখে খুব আশীর্বাদ করে বলেন, ''বিশ্বাস কর্, তাঁর শক্তি তোদের ভিতর সংক্রমিত হয়েছে। জানবি সঙ্ঘই ঠাকুরের সমষ্টি শরীর।''[৫৪] আবার গুরুভাবের পরাকাষ্ঠায় আশ্বাস দেন : ''দেখ..., আমি যার মাথায় হাত বুলিয়েছি, তার কোন ভাবনা নেই।''[৫৫]

গুরু শেখান কীভাবে কর্ম যোগে পরিণত হয়। কারণ তাঁর মতে, ''জাগতিক কাজকর্ম যে ঠিক ঠিক করতে পারে, তার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভও সম্ভব।''[৫৬] আর সেইসঙ্গে সচেতন করেন, গুরু বা গুরুতুল্য ব্যক্তির প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তার কথা। ব্যক্তিজীবনে ধর্মলাভের পিপাসা যতই প্রবল হোক না কেন 'বেহেড' হওয়া একেবারেই না-পছন্দ তাঁর। বুদ্ধি ও যুক্তি সহায়ে ধীরে ধীরে উন্নতিই শ্রেয়। ভাব-বিহ্বলতা, বিচার-বিমুখতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেন না তিনি। ''মেনিমুখো' হোসনি'', ''বীর হ তোরা'', ''কাজে লেগে যা''—এইসব ছিল তাঁর কথা। এসব কথা অতি সাধারণ কথার কথা নয়—এ যেন 'মন্ত্র'। আর তাঁর সকল কথার পিছনে থাকত এক সুবিপুল শক্তি—একবার শুনলেই যা মনে গেঁথে যেত।[৫৭]

এক এক সময় হাসি-তামাশার মধ্যেও ''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম''—এই ভাবটি ভিতরে ঢুকিয়ে ছাড়েন গুরু। তাই সেই মজা-হাসির ধ্বনিতরঙ্গ ধাপে ধাপে—একগ্রাম থেকে আর এক গ্রামে উঠতে

উঠতে একসময় শ্রোতাদের মনকে ঊর্ধ্বায়িত করতে করতে বিরাট মহিমায় উত্তীর্ণ করত। যেসব আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলিকে মানব তার জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে—সেগুলো তাঁর কাছে যেন ছেলেখেলা। হাসতে হাসতে হয়তো মনটাকে নিরোধ করেছিলেন। হাসি বা ঠাট্টার মধ্যেই অন্তরে এমন ইঙ্গিত ও স্পর্শ দিয়ে দিতেন যে, ওতেই সব কাজ হয়ে যেত।[৫৮] স্পর্শমাত্রে ঈশ্বরবিশ্বাস সঞ্চার করে দিতেন তিনি।[৫৯] একদা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, একদিন নরেন স্পর্শমাত্রে শক্তিসঞ্চার করতে পারবে।

আট

স্পর্শ তো কেবল দৈহিক নয়, হতে পারে তা কথার কিংবা ভাবেরও। জগদ্‌গুরু দীক্ষা দেন প্রাণে—যুগে যুগে কালে কালে উজ্জীবিত করেন তাঁরা।

গুরুশক্তি দেশাতীত, কালাতীত। স্বামীজীর কথার মধ্যে ভাব যেন চনমন করে বেড়াত। তিনি তাঁর অপূর্ব বক্তৃতাকালে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনটাকে যেন সমষ্টিগতভাবে আকর্ষণ করে তাঁর বিরাট সত্তার মধ্যে গ্রহণ করতেন। যেমন যেমন তাঁর মন ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর ভাবরাজ্যে উঠতে থাকত, শ্রোতাদের মনও সেই ভাব অনুসরণ করতে থাকত।[৬০]

সাধারণভাবে অতিগভীর কথা তিনি অনর্গল বলে যেতেন। এ যে অন্তরকে জাগিয়ে তোলা—অন্তরের দীক্ষা। শ্রোতার ধমনীতে শুরু হত উষ্ণ শোণিতপ্রবাহ। তাঁর প্রতিটি বাণীর পিছনে একটা শক্তি কাজ করত, কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রোতাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত একটা সমগ্রতার চেতনায়। আর সেই ভাবটিই সারাজীবনের পাথেয় ও সাধনস্বরূপ হয়ে উঠত।[৬১] বাণী তো নয়—এ যে শক্তিপ্রদ জ্যোতির্ময় ভাবপ্রবাহ।

স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি গুরু। তিনি যে আদর্শ (principle)-এর এক প্রতিমূর্তি! স্বামীজী তো রক্তমাংসে তৈরি ছিলেন না—তিনি ছিলেন ভাব (idea) দিয়ে গড়া। ভাবস্বরূপ বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"একদিন হয়তো জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো আমার এই শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাব, কিন্তু আমি কোন দিন কর্ম থেকে ক্ষান্ত হব না। যতদিন পর্যন্ত না জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মধ্যে প্রেরণা যোগাতে থাকব।"[৬২]

চলে গেছেন স্বামীজী—'সেতু'টি তৈরি করে দিয়ে। ফিরে এসেছেন স্বামীজী। তিনি যে জগতের গুরু—তিনি যে আচার্য! তাঁর গুরু তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন বিশাল বটগাছ-রূপে—যার ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় পাবে, বিশ্রাম পাবে, পাবে পথ চলার শক্তি, প্রেরণা।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল বটগাছটির ছায়ায় এ এক উলটো-পুরাণের দেশ। পথিকেরা আসে—যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরের মাধুর্যে পায় শক্তি, আনন্দ। অজ্ঞান-পাশ আলগা হয়। তমের আবরণ হয়ে ওঠে স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর। বিক্ষেপের টানাপোড়েন মুছে যায়, ঘুচে যায়।

পথিকেরা তাদের অন্তরের অন্তস্থলে কান পাতলেই শুনতে পায় এক অচিন কম্বুকণ্ঠের গর্জন : ওঠো, জাগো, কী করছ? আবার কখনও বাঁধনহারা ভালবাসার কলস্বর, কখনও বা আবদার-অভিমান, আর কখনও মিনতি। সুদূরপথের যাত্রীরা উপলব্ধি করে—আমার মুক্তির অপেক্ষায় আজও—আজও সে-মানুষটি স্বেচ্ছায় বদ্ধ। স্বতোমুক্ত গুরু আজ বদ্ধ চিরলীলার বন্ধনে। সেই গুরু, সেই চিরপ্রতীক্ষারত পিতা-মাতা-প্রেমাস্পদ-চিরসখা-দাস চিরবালকটির জন্যই তাই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা...

ধ্রুবতারা-সম সদাজাগ্রত গুরুর পদ্মপলাশলোচন দুটি আমাদেরই জন্য আজও পথ চেয়ে... আমাদেরই জন্য আজও অপেক্ষায়...

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩), খণ্ড ১ পৃঃ ১৬৩
২। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১০
৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৪১
৪। তদেব, পৃঃ ১৬৩
৫। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৪৭
৬। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ২৫০
৭। দ্রঃ, *যুগনায়ক*, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৪
৮। তদেব, পৃঃ ১৫২
৯। তদেব, পৃঃ ১৬৪
১০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২০১
১১। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ১০
১২। *যুগনায়ক*, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬৪
১৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৭৪
১৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ২৮৬
১৫। তদেব
১৬। তদেব, পৃঃ ২০৫
১৭। তদেব, পৃঃ ৬৯৬
১৮। তদেব, পৃঃ ৩৪২
১৯। তদেব, পৃঃ ৪০১
২০। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ১১৯
২১। দ্রঃ, তদেব—পাদটীকা
২২। তদেব, পৃঃ ২৬২
২৩। স্বামী অজ্ঞজানন্দ, *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৪), পৃঃ ২২৮
২৪। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, ১৯৯২), পৃঃ ২১৮-১৯
২৫। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ২, পৃঃ ১৬৯
২৬। সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, *মহিমা তব উদ্ভাসিত*, (শ্রীসারদা মঠ, ১৯৯৫), পৃঃ ৫৫৮ এবং ৫৬৪
২৭। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ২১৮
২৮। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ১৭৯
২৯। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৫৫
৩০। দ্রঃ *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ১৭১
৩১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২২৭
৩২। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ২১৫
৩৩। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ২৪৮
৩৪। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৪৯
৩৫। তদেব, পৃঃ ২৫৪
৩৬। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ৫৫
৩৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৪২
৩৮। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে* পৃঃ ১৪ এবং *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ৪২
৩৯। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ৩০
৪০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৫৪
৪১। তদেব, পৃঃ ৩৫
৪২। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ২৩২
৪৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৮৭
৪৪। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ১১
৪৫। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৪২
৪৬। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৭৬
৪৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৫৪
৪৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৪৯
৪৯। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১০১
৫০। তদেব, পৃঃ ৪৯
৫১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৪১
৫২। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ১২৭-২৮
৫৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৪৩
৫৪। তদেব, পৃঃ ৭২
৫৫। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ৬২
৫৬। তদেব, পৃঃ ৬৪
৫৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১৮
৫৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১৫
৫৯। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৪
৬০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১১
৬১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১৪
৬২। তদেব, পৃঃ ১৯